ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

সরকার তথ্যপ্রযুক্তি আইনের আলোচিত চারটি ধারা বিলুপ্ত করে নতুন 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬'র খসড়া প্রণয়ন করেছে। আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সাইবার আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে। মতামত নেয়া হয়েছে বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়, সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজ্ঞ, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির ব্যক্তিবর্গ, আইসিটি স্টেকহোল্ডারদের। আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ, টিআইবি, গ্রামীণফোন, বেসিস, বিনিয়োগ বোর্ড এবং সাংবাদিকদের সাথেও। খসড়া আইনটি উপস্থাপনের আগে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়েছে। তার কার্যালয় যেসব পর্যবেক্ষণ পাঠিয়েছে, তা খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন'-এর সবচেয়ে বড় চমক বা বৈশিষ্ট্য হলো এই আইনে আগের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত ৫৭ ধারাও বিলুপ্ত হয়েছে। ২০০৬ সালে প্রণীত তথ্যপ্রযুক্তি আইন বিভিন্ন সময়েই আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ আইনে আটক করা হয় সাংবাদিক প্রবীর শিকদারকে। সবশেষ আইনটি প্রয়োগ করা হয় নিউজপোর্টাল বাংলামেইলটুয়েন্টিফোরডটকমের ক্ষেত্রে। শুরু থেকেই আলোচিত হলেও প্রবীর শিকদারকে আটকের পর থেকে আইনটির ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশ্ন ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সাথে আলোচনা করে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিতর্কিত ধারাগুলোর বিলুপ্তি-সংযোজন ঘটিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া প্রস্তুত করে।

বিভিন্ন ধারার তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে। আর প্রতিটি ধারায়ই কমানো হয়েছে শাস্তি ও জরিমানা। নতুন 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৬'র খসড়ায় বলা হয়েছে, এ ধরনের অপরাধ করলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড, সর্বনিম্ন দুই মাস বা সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। মানহানির বিচার করা হবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ আইন অনুযায়ী।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মতো পর্নোগ্রাফি আইনের কয়েকটি ধারাও এ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৪ ধারায় 'কমপিউটার দূষণ, কমপিউটারের তথ্য-উপাত্ত ভাণ্ডার নষ্ট করা'র শাস্তি অনধিক ১০ বছরের কারাদণ্ড, ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ছিল। প্রস্তাবিত খসড়া আইনে 'কমপিউটার, মোবাইল, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক জালিয়াতি'র সর্বনিম্ন সাজা এক বছর থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৫ ধারায় কমপিউটার সোর্স কোড পরিবর্তনসংক্রান্ত অপরাধের জন্য যে অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড বা ৩ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান ছিল তা নতুন আইনে (১১ ধারা) করা হয়েছে সর্বোচ্চ এক বছর বা উভয় দণ্ড। তথ্যপ্রযুক্তি আইনে কোনো প্রকৃত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত কল্পমূর্তির ক্ষেত্রেও শাস্তি আরোপ করার সুযোগ ছিল, যা প্রস্তাবিত আইনে শিথিল করা হয়েছে।

এ ছাড়া কমপিউটার সিস্টেম হ্যাকের ব্যাপারে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৬ ধারায় যে অনধিক ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান ছিল, তা প্রস্তাবিত খসড়া আইনে করা হয়েছে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, সর্বনিম্ন এক বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড। এতে হ্যাকের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে 'পরিচয় প্রতারণা এবং ছদ্মবেশ ধারণ', আর এটি স্থান পেয়েছে ১২ ধারা হিসেবে।

এগুলো নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হলো, সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ তথা দমনের নামে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগও আমরা সম্প্রতি দেখেছি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে কাজ করেন এমন অনেকে মনে করেন, মূলধারার গণমাধ্যম যখন রাষ্ট্রীয় নানা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগের বিরুদ্ধে চুপ থাকে বা থাকতে বাধ্য হয়, তখন ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সোচ্চার হয়ে ওঠে; তখন প্রতিবাদের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে ফেসবুক। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র সব সময়ই এই বিকল্প মাধ্যমকে 'ভয়' পায় এবং সে কারণেই এই মাধ্যমকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়।

সুতরাং সাইবার অপরাধ দমনে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য এবং সেটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যও জরুরি। অশুভ উদ্দেশ্যে কমপিউটারের তথ্য নষ্ট করা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া তথ্য পাচার করা, অন্যের কমপিউটার ব্যবস্থায় অনধিকার প্রবেশ, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য, ছবি প্রকাশ বা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয় ইত্যাদি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু অনেক সময়ই আইনে অপরাধের সংজ্ঞা পরিষ্কার থাকে না, যে কারণে লঘু পাপে গুরুদণ্ড পেতে হয় অনেককে। আবার বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের সুযোগ রাখা এবং আসামির জামিন না পাওয়ার মতো বিষয়গুলো এরই মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি আইনকে একটি 'কালাকানুনে' পরিণত করেছে।

সুতরাং সাইবার অপরাধ দমনে যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হয়েছে, সাথে সাথে সরকারকে এই নিশ্চয়তাও দিতে হবে যে, এ আইনে নাগরিকেরা হয়রানির শিকার হবে না। এ আইন বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করবে না। ডিজিটাল সিকিউরিটির নামে এ আইন ভিন্নমত বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার হবে না। আর এসব নিশ্চিত করার জন্য আইনটিতে রাষ্ট্রপতির সই হওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে এর একটি বিধিমালা করতে হবে, যেখানে আইনের প্রয়োগ, অপরাধের ব্যাখ্যা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর এখতিয়ার, বাকস্বাধীনতা ও তার সীমানা ইত্যাদি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার মতো যেকোনো লেখাকে কারও সম্মানহানি বা ধর্মীয় উস্কানি হিসেবে চালিয়ে দিয়ে আটকের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সে জন্য আইনে নাগরিকের পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

আইনের প্রতি মানুষের ভয় নয়, বরং যাতে শ্রদ্ধা তৈরি হয়, সেভাবে আইনটি প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার মতো বিধানের ভয়ে নাগরিকেরা তটস্থ থাকবে এবং ভেতরে ভেতরে একটা ভয়ের সংস্কৃতি জারি থাকবে, যা কোনো অর্থেই গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত সমাজ গঠনের অনুকূল নয়।

মুক্তিযুদ্ধের তথ্যের বিকৃতি রোধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে এই বিষয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এটা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন সময় ইতিহাস বিকৃতির যে ঘটনা ঘটেছে তা রোধ করতে সহায়ক হবে। তবে সরকারকে এই আইন প্রয়োগের সময় খুবই সংবেদনশীল হতে হবে, যাতে এই আইনের কারণে মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্ট গবেষণা বা এই বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা কোনো বাধার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। গবেষকেরা যাতে তাদের মেধাশক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে স্বাধীন মতো তাদের গবেষণা চালাতে পারেন, সেই বিষয়ে সরকারকে যথাযথ নিশ্চয়তা দিতে হবে কজ

ফিডব্যাক :
jabedmorshed@yahoo.com